XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯২ বর্ষ ২৬২ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৩ পৌষ ১৪২০ কলকাতা

লাভ-ক্ষতি

রাহুল গাঁধীর কথা অমৃতসমান। বৎসরের গোড়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, ক্ষমতা বিষ। দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আম আদমি পার্টি মন্ত্রিসভা গড়িতে যে পরিমাণ অনীহা দেখাইতেছে, তাহাতে সংশয় হয়, কংগ্রেস সহসভাপতির কথাটি বুঝি অকাট্য। বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু একক বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে। তাহার পরেও সরকার না গড়িবার সিদ্ধান্তটিতে পলায়নী মনোবৃত্তি প্রকট। কংগ্রেস, আপন কর্মফলেই, আগামী পাঁচ বৎসর তাহাদের পথে বাধা হইবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবে না। আপ-ও এক প্রকার জানাইয়া দিয়াছিল, প্রশ্নভিত্তিক সমর্থনে তাহাদের অমত নাই। কাজেই, বিজেপি সরকার গড়িতেই পারিত। তাহাতে গণতন্ত্রের একটি বৃহৎ অনুশীলনেরও অবকাশ থাকিত, যেখানে যে কোনও প্রশ্নেই শাসক এবং বিরোধীর একমত হওয়া আবশ্যিক হইত। বিজেপি সেই পথে হাঁটিল না।

আম আদমি পার্টির নিকট যে এই বিপুল নির্বাচনী সাফল্য অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহা দলের নেতারাই স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন, একক বৃহত্তম দলও নহেন— কিন্তু বিজেপি-র সিদ্ধান্তে আপ সরকার গঠনের সুযোগ পাইয়াছে। কংগ্রেস নিঃশর্ত সমর্থনের কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। আপ-এর নেতারা সরকার গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে যে ১৮ দফা দাবি পেশ করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহাতেও আপত্তি করে নাই। যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপ-এর ন্যায় একটি সদ্যোজাত দলকে ভোট দিয়াছে, এবং সরকার গঠনেরও সুযোগ আসিয়াছে, তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য। কিন্তু, সেই পথে না হাঁটিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা ফের দিল্লিবাসীর নিকট চিঠি লিখিয়া, এসএমএস করিয়া, পথসভা করিয়া জানিতে চাহিতেছেন, সরকার গঠন করা কি উচিত হইবে? যেখানে মানুষ ভোটিং মেশিনেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, সেখানে ফের প্রশ্নটি তুলিবার অর্থ কী? আপ নেতারা বলিতে পারেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একটি নূতন মডেল পরীক্ষা করিতে চাহিতেছেন, যেখানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের মত যাচাই করিয়া লওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিক ভাবে এই অবস্থানটি উড়াইয়া দেওয়ার নহে। কিন্তু, প্রথমে সমর্থন গ্রহণের শর্তাবলি পেশ করা, তাহার পর মানুষের রায় লইতে চাওয়া— কেহ যদি বলেন, সব মিলাইয়া বোধ হইতেছে আম আদমি পার্টি ঘুরপথে সরকার গঠনের দায় এড়াইতে ব্যস্ত, কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় থাকিবে কি?

'অরাজনৈতিক' মানুষদের সংগঠিত করিয়া নির্বাচনে আশাতীত ফল করিলেও আপ রাজনীতির পরিসরে হালে পানি পাইতেছে না, এই আশঙ্কাটি প্রকট হইয়া উঠিতেছে। তাহা কেবল এই দলটির পক্ষেই দুর্ভাগ্যজনক নহে, ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষেও একটি বড় ক্ষতি। 'রাজনৈতিক' দলগুলির উপর যে বহু মানুষ আস্থা হারাইয়াছেন, তাহা দিল্লির নির্বাচনে স্পষ্ট। গোটা দুনিয়াতেই রাজনৈতিক পরিসরের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে নাগরিক সমাজের উত্থান ঘটিতেছে। কিন্তু, সেই 'অরাজনৈতিক' শক্তিকে রাজনীতির পরিসরে আনিয়া গণতন্ত্রের পরীক্ষায় বসাইবার কাজটি অরবিন্দ কেজরিওয়ালরাই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই 'স্পর্ধা' ফলপ্রসূ হইয়াছে। অনুমান করা চলে, দেশের অন্য প্রান্তেও এমন ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটিবে। কিন্তু, নির্বাচনে জয়লাভের পর কী— এই প্রশ্নটির একটি সন্তোষজনক উত্তর যদি কেজরিওয়ালরা না দিতে পারেন, যদি প্রতিভাত হয় যে নিজেদের সাফল্যকে গণতান্ত্রিক পরিসরে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, তবে এই গোত্রের 'অরাজনৈতিক' রাজনৈতিক শক্তির উপর মানুষ বিশ্বাস হারাইতে পারেন। তাহাতে মস্ত ক্ষতি। সেই ক্ষতি এড়াইবার দায় একান্ত ভাবেই কেজরিওয়ালদের। দিল্লিতেই তাঁহাদের প্রমাণ করিতে হইবে, জনাদেশের সম্মান রক্ষার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে।

পথে বসিবার প্রস্তুতি

পরিবর্তন সত্যই আসিয়াছে। সে কালে পড়ুয়ারা পরীক্ষায় খারাপ ফল করিলে অভিভাবকরা তাহাদের তিরস্কার করিতেন, মন দিয়া লেখাপড়া করিতে বলিতেন, ছেলেমেয়েকে পড়াইতে বসিতেন, ভাল গৃহশিক্ষকের খোঁজ করিতেন। ছাত্রছাত্রীরাও কিছুটা দুঃখে ও অনুতাপে, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বা ভাল করিবার প্রতিজ্ঞায় পাঠে মন দিত। এ কালে পরীক্ষায় খারাপ করিলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা একযোগে রাজপথে বসিয়া যান চলাচল রোধ করেন। সোমবার শ্যামবাজারের একটি প্রাচীন এবং এক কালের খ্যাতনামা স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক-এর টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য কিছু পড়ুয়া ও তাহাদের অভিভাবকরা এমনই এক ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। 'সৃষ্টি' না বলিয়া 'লালন' করিলেন বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, 'ফেল নয়, পাশ চাই' দাবিতে অনুরূপ অবরোধ বিক্ষোভের ঘটনা গত বছরেও ঘটিয়াছে। এক নয়, অনেক। বুঝিতে অসুবিধা নাই, নূতন ঐতিহ্য তৈয়ারি হইতেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষার ফল উল্টাইয়া দিবার ঐতিহ্য। ইহাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার আর উপায় নাই, অঙ্কুর ইতিমধ্যেই ডালপালা মেলিয়াছে।

সম্পূর্ণ অন্যায় জুলুমের এই বিষবৃক্ষটি মহীরুহে পরিণত হইবার আগে যদি তাহাকে বিনাশ করিতে হয়, প্রথম কাজ আপসহীন ভাবে তাহার মোকাবিলা। কোনও স্কুলে কোনও অবস্থাতেই চাপে পড়িয়া নতিস্বীকার করা চলিবে না। সে জন্য প্রশাসনকে সর্বপ্রকারে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে হইবে। সোমবারের ঘটনা উপলক্ষে শিক্ষামন্ত্রী তেমন কঠোরতার পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন। এই অবস্থানে অবিচল থাকা তাঁহার কর্তব্য। প্রয়োজনে স্কুলের পাশে দাঁড়ানো তাঁহার দায়িত্ব। কঠোরতায় যে ফল হয়, শ্যামবাজারের স্কুলটির ঘটনাচক্র হইতেই তাহা স্পষ্ট— বিক্ষোভের পরের দিন খাতা দেখিয়া বিক্ষুব্ধ পড়ুয়া ও অভিভাবকরা ফল মানিয়া লইয়াছেন! তবে অভিভাবকদের খাতা দেখানো যদি রীতি না হয়, তাহা হইলে রাস্তা অবরোধের পরেই বা তাহা কেন দেখানো হইবে, সে প্রশ্নও উঠিবেই। ইহাও কিন্তু আপস।

যে অভিভাবকরা স্কুলের উপর চাপ দিতে 'আন্দোলন' করেন, তাঁহাদের আত্মসংযমের দায় আছে। অন্যদেরও কিন্তু দায় আছে এই উন্মার্গগামী অনৈতিক আচরণ হইতে তাঁহাদের নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হওয়া। সমাজের এক অংশের অন্যায় গোটা সমাজকে বিপথে চালিত করিতে পারে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, নীতি ও শৃঙ্খলার ক্ষতি সাধন করিতে পারে। বিশেষ করিয়া স্কুলের পরিসরেই যদি অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলার অভ্যাস তৈয়ারি হয়, তাহার পরিণাম সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ এই প্রক্রিয়ার সাক্ষী ও শিকার। ষাট-সত্তরের দশকে শিক্ষাজগতের যে সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহার কুফল আজও ফুরায় নাই। তাহার পরে ক্রমে এক ধরনের স্থিতি আসিয়াছিল। সেই স্থিতি উৎকর্ষ আনিতে পারে নাই, তাহা অন্য সমস্যা। স্থিতির আড়ালে বহু অনিয়মও সাধিত হইয়াছে, কিন্তু সেই অনিয়ম সাধারণত আড়ালেই থাকিয়াছে। বর্তমান জমানায় অন্য অনেক বিষয়ের মতোই এ ক্ষেত্রেও অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা অতিমাত্রায় প্রকট। ইহা উদ্বেগের কারণ। জুলুমের দ্বারা নিয়ম ভাঙিবার রীতি এক বার প্রচলিত হইলে শিক্ষার কাঠামোই ভাঙিয়া পড়িবে। পরিণাম ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও শুভ হইবে না। পথে বসিয়া নম্বর বাড়াইতে গিয়া যাঁহারা আপন সন্তানের ভবিষ্যৎটিকে পথে বসাইতেছেন, তাঁহারা ঈষৎ কাণ্ডজ্ঞান সংগ্রহ করিলে সন্তানদেরই মঙ্গল।

পাতে যেন ভাত-আলুসেদ্ধটুকু জোটে

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

যে খাবারগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের খাওয়া না-খাওয়া নির্ভর করে, ফাটকাবাজদের হাতে তার জোগানের ভার পুরোটা ছাড়লে চলবে না। সরকারের দায়িত্ব আছে।

সাময়িক স্বস্তি। শ্যামবাজারের মোড়ে সরকারি উদ্যোগে পেঁয়াজ বিক্রি।

অতি জরুরি খাবারের দাম বেড়ে যাওয়ার জ্বালায় কিছু দিন যাবৎ মানুষ নাজেহাল। কিছু খাবার আছে, যেগুলোর দাম সাময়িক ভাবে বেড়ে গেলে তা না খেলেও চলে— একশো টাকা কেজি বেগুন আর ক'জনই বা খান। কিন্তু, আলু বা চালের মতো জিনিসের দাম বাড়লেও খাদ্যতালিকা থেকে তা সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখার উপায় বেশির ভাগ মানুষেরই নেই। তার বড় কারণ হল, এগুলোই গরিবের একমাত্র খাবার— অন্য জিনিসের দাম আরও বেশি। ফলে, মধ্যবিত্তের পকেটে চাপ পড়ছে, আর গরিবের পেটে টান। একটা ছোট্ট ফুটোর জন্য যেমন বিশাল জাহাজ ডুবে যেতে পারে, গণতন্ত্রে তেমনই আপাততুচ্ছ আনাজের দাম সরকার উল্টে দিতে পারে। দিল্লিতে শীলা দীক্ষিত বা রাজস্থানে অশোক গহলৌত অনেক কাজ করেছিলেন, এটা কেউ অস্বীকার করছেন না— কিন্তু তাঁদের নির্বাচনী ভরাডুবি হল। তাতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ভূমিকা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

এ দিকে রাজ্যে অবস্থা সামলাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলুর দর বেঁধে দিলেন। আড়তদার ও হিমঘরের মালিকদের জোর করে আলু বাজারে ছাড়তে বাধ্য করা যেতে পারে। একই যুক্তি খাটে চালের মতো অন্যান্য মজুতযোগ্য খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও। কিন্তু, এই পথে অনেক মুশকিল। প্রথমত, এতে বড় জোর সাময়িক ভাবে সমস্যা মিটতে পারে, কিন্তু রোগ দূর হবে না। দ্বিতীয়ত, বাজারের স্বাভাবিক ছন্দে হস্তক্ষেপ করলে তার প্রভাব অন্যত্র পড়তে পারে। তাতে আখেরে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। তৃতীয়ত, কোনও সুচিন্তিত নীতির কাঠামো ছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারে যত্রতত্র হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়— আড়তদারদের প্রতি সরকারের, বা জনগণের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না থাকলেও।

কিন্তু সরকারকে পথ তো খুঁজতে হবে। মজুত করে রাখা যায়, এমন অত্যাবশ্যক খাদ্যপণ্যের (যথা চাল, আলু, পেঁয়াজ) ক্ষেত্রে এই লেখায় তেমন কিছু পথের সন্ধান করব। কিন্তু যে কোনও নীতির রূপায়ণেই হাজার সমস্যা, আর বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে আকস্মিক ভাবে পথ পরিবর্তনে হিতে বিপরীত হতে পারে। ভাল করে ভেবে, আলোচনা করে, আইন তৈরি করে তবে সে পথে হাঁটতে হবে।

একটা পথ হল, সরকার ঘোষণা করতে পারে, বাজারে কোনও নির্দিষ্ট পণ্যের দাম কোনও একটি মাত্রা পেরোলেই মজুতদারদের কম দামে পণ্য বাজারে ছাড়তে বাধ্য করা হবে। যে কোনও জিনিসের দাম প্রতি বছর খানিকটা করে বাড়ে। সেটা 'স্বাভাবিক বৃদ্ধি'। ধরুন, পণ্যটি চাল। সরকার স্থির করতে পারে, এই ডিসেম্বর মাসে চালের স্বাভাবিক দাম গত পাঁচ বছরের ডিসেম্বর মাসের দামের গড়। আর, স্বাভাবিক বৃদ্ধির সীমা সেই গড়ের দ্বিগুণ। গত পাঁচ বছরের গড় দাম যদি কিলোগ্রামপ্রতি ২০ টাকা হয়, তবে এই বছর ডিসেম্বরে সেই চালের দাম চল্লিশ টাকা পর্যন্ত হলে সেটা স্বাভাবিক। দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কোনও চেষ্টা করবে না। কিন্তু চালের দাম ৪০ টাকার বেশি হলেই সরকার চালের মজুতদারদের কম দামে (ধরুন, ৩০ টাকা দরে) বাজারে বেচতে বাধ্য করবে। একে 'ট্রিগার স্ট্র্যাটেজি' বলা যায়।

সরকারও আলু কিনুক

মুশকিল হল, এতে যেমন চালের দাম কখনও চল্লিশ টাকার সীমা ছাড়াবে না, তেমনই দাম তার চেয়ে কমবেও না। সরকারের নীতি সবারই জানা— চালের দাম চল্লিশ টাকা অবধি হলে সরকার কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবে না। তার মানে, চালের দাম কিলোগ্রামপ্রতি ৩৮ টাকাতেও রাখা যায় আবার ৪০ টাকাতেও রাখা যায়— কোনও ক্ষেত্রেই সরকারের কিছু বলার নেই। সবচেয়ে বেশি লাভ চল্লিশ টাকাতেই। এ দিকে, বাজারে চালের মজুতদারদের হাতে কম-বেশি একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকেই চাইবে যে চালের দাম চল্লিশ টাকাতেই থাকুক। ফলে, চালের দাম ওই চল্লিশ টাকাই দাঁড়াবে।

তবে কি এই পথে হেঁটে কোনও সমাধানসূত্রে পৌঁছনো যাবে না? অবশ্যই যাবে। তবে আমরা একটু ঘুরপথে সেখানে গিয়ে পৌঁছব। আলুর বাজারের উদাহরণটাই নেওয়া যাক। প্রচলিত ব্যবস্থায় চাষিরা মাঠ থেকে ফসল তুলে হিমঘরে তা জমা রাখেন। বিনিময়ে একটি রসিদ পান, যা 'আলু বন্ড' নামে পরিচিত। হিমঘর থেকে আলু বের করার সময় সেই বন্ড ফেরত দিতে হয়। যার কাছে এই বন্ড আছে, বাঁধা দামে হিমঘরের ভাড়া চুকিয়ে তিনি সেই আলু খোলা বাজারে চলতি দামে বিক্রি করতে পারেন। ঠিক সময়ে বেচতে পারলে লাভের সম্ভাবনা প্রবল।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, কবে বাজার চড়বে আর কবে যথেষ্ট লাভ পাওয়া যাবে, সেই অপেক্ষায় বসে থাকার মতো টাকার জোর ছোট চাষিদের থাকে না। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আলু বন্ডটি বিক্রি করে দেন। কেনেন ফড়েরা। তাই তাঁদের হাতে বাজারের দাম প্রভাবিত করার মত ক্ষমতা এসে যায়। এই বিনিময়টি ঘটে অলিখিত ভাবে, কারণ আলুর বাজারে সত্ত্ব বিক্রি করার আইন নেই।

সরকারের প্রথম কর্তব্য, এই বিনিময়টিকে আইনি করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, একটি ন্যূনতম ক্রয়মূল্য স্থির করে দিয়ে এই বাজারে বন্ড কিনতে নামা। চাষিরা সরকারের কাছে তাঁদের উৎপন্ন ফসল বিক্রি করতে পারেন অথবা বাজারেও বিক্রি করতে পারেন, এমন ব্যবস্থা ধান বা গমের মতো শস্যের ক্ষেত্রে অতি পরিচিত। আলুর ক্ষেত্রেও তা চালু না হওয়ার কারণ নেই। এতে দুটো লাভ। এক, আলাদা পরিকাঠামো তৈরি না করে, বাজারের হিমঘরেই আলু মজুত রেখেও সরকার হাতে যথেষ্ট আলুর জোগান রাখতে পারে। দুই, সরকার যেহেতু মুনাফা করার জন্য এই বাজারে আসে না, ফলে বাজারের ফড়েদের তুলনায় সরকার অপেক্ষাকৃত বেশি দামেই আলু কিনতে পারে। তাতে চাষির লাভ।

পাঁচ বছর অন্তর ভোটের সময় রাজনীতিকদের মানুষের কাছে আসতেই হবে। খুব বেপরোয়া নীতি, ফলে, তাঁদের পক্ষে প্রণয়ন করা মুশকিল। তার ওপর, এখন গণমাধ্যম আছে।

এখন, সরকার চাষিদের থেকে আলু বন্ড কিনে নিলে সরকারের হাতে যথেষ্ট আলু মজুত থাকবে। মজুতদাররা তখন জানবেন, দাম চড়লেই সরকার স্বল্প মূল্যে আলু বাজারে ছাড়তে থাকবে, এবং বাজারের দাম ফের পড়ে যাবে। কাজেই, ফাটকা খেলে দাম বাড়ানোর প্রবণতা কমবে। একটু আগে যে ট্রিগার স্ট্র্যাটেজি-র কথা বলছিলাম, তার পথে প্রধান বাধাটি ছিল ব্যবসায়ীদের দাম বাড়িয়ে রাখার ক্ষমতা। সরকার আলুর বাজারে ঢুকে পড়লে সেই ক্ষমতার দফারফা। এ বার সেই স্ট্র্যাটেজির পথে সরকার হাঁটতেই পারে। কখনও, কোনও কারণে আলুর দাম অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলে সরকারের হাতে এখন দুটো অস্ত্র থাকবে— আড়তদারদের কম দামে আলু ছাড়তে বাধ্য করা যাবে, আবার নিজের হাতে থাকা আলু বাজারে ছেড়েও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

সমাধানসূত্রটি বোঝানোর জন্য এখানে আমরা আলুর উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু একই যুক্তিতে চাল বা অন্য কোনও মজুতযোগ্য খাদ্যপণ্যের বন্ডের কথাও ভাবা যেতে পারে। পণ্যটি মজুতযোগ্য হবে, এটাই একমাত্র শর্ত।

মানুষের আয় বাড়ান

কী ভাবে খাবারের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা যায়, তার একটি পন্থার কথা বলেছেন অমর্ত্য সেন। তিনি দেখিয়েছেন, খাদ্যের মোট জোগান না কমলেও, সমাজের একটি অংশের প্রকৃত আয় যদি কমে যায়, তা হলে সেই অংশের মানুষ যথেষ্ট খাবার কিনতে পারবেন না। এটাই অনেক বড় মাপে ঘটলে দুর্ভিক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। অমর্ত্য সেনের মতে, বাজারে একটি জরুরি পণ্যের দাম বাড়তে আরম্ভ করলে সরকারের কর্তব্য গরিবের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা, যাতে মানুষের প্রকৃত আয় হঠাৎ কমে না যায়। ভারতের কর্মসংস্থান যোজনা সেটাই নিশ্চিত করে। অমর্ত্য বলেছেন, কোনও পণ্যের দাম বাড়ার পর মানুষের আয় বাড়লে সে পণ্যের চাহিদাও আরও বাড়বে। ফলে দামও বাড়বে। ফলে আরও জোগানদাররা, অন্য রাজ্য থেকেও, এ বাজারের দিকে আকৃষ্ট হবে। যে বাজারে স্থানীয় মজুতদারদের কার্যত একচেটিয়া অধিকার ছিল, তা অনেকটা প্রতিযোগিতার বাজার হয়ে দাঁড়াবে। এবং, সেই প্রতিযোগিতার বাজারে অস্বাভাবিক স্ফীত মূল্যস্তর টিকতে পারে না। ফলে, দামও কমতে থাকবে। তবে হ্যাঁ, এই ব্যবস্থার একটা অন্য দিক আছে। ভিন রাজ্যের জোগানদারদের নড়েচড়ে বসতে যে সময় লাগবে, তখনকার মতো বাজারে জোগান বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। সরকার যদি আলু বন্ডের বাজারে নামে, ট্রিগার স্ট্র্যাটেজিও ব্যবহার করে, তবে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

মানুষের হাতে টাকা থাকলেই কি খিদের মোকাবিলা করা যাবে? না। যত ক্ষণ বাজারে এক শ্রেণির মানুষের হাতে দাম নির্ধারণের, বা জোগান কমানো-বাড়ানোর ক্ষমতা থাকছে, তত ক্ষণ নয়। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতেই হবে, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। খাদ্যের জোগানও বজায় রাখতে হবে। আয় বাড়ানোর কাজটা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। খাবারের জোগান অব্যাহত রাখার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

এই পথের প্রধান সমস্যা দুর্নীতি। সরকারের তরফে যাঁরা চাষিদের থেকে বন্ড কেনার দায়িত্ব পাবেন, এবং প্রয়োজনের সময় সেই খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত করবেন, তাঁরা নিজেরাই ফাটকাবাজদের মতো আচরণ করতে পারেন বা, তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন। কিন্তু, ফাটকাবাজদের সঙ্গে এই অসৎ আধিকারিকদের একটা ফারাক থাকবে— সরকার প্রয়োজনে তাঁদের জবাবদিহিতে বাধ্য করতে পারবে।

আর একটা সমস্যা হল, টাকা সর্বত্রগামী। যাঁরা এখন বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন, সরকার এই বাজারে এলে তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগবে। অনুমান করা চলে, তাঁরা টাকার জোরেই সরকারি নীতি বদলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এখানেও একটা রুপোলি রেখা আছে। পাঁচ বছর অন্তর ভোটের সময় রাজনীতিকদের মানুষের কাছে আসতেই হবে। খুব বেপরোয়া নীতি, ফলে, তাঁদের পক্ষে প্রণয়ন করা মুশকিল। তার ওপর, এখন গণমাধ্যম আছে। অমর্ত্য সেন বহু দিন আগে, দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতেই, গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা বলেছিলেন। সেই নজরদারি এড়িয়ে যাওয়া রাজনীতিকদের পক্ষে কঠিন হবে।

মৈত্রীশবাবু লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক